ঢাকাগামী নির্ধারিত লঞ্চে উঠার জন্য মহসিন মামার সাথে পঞ্চরত্ন গেল বরিশাল লঞ্চঘাটে। রাতের বেলায় নদীর জলের উপর ঢাকাগামী লঞ্চগুলাকে মনে হচ্ছিল ভাসমান আলোর দ্বীপ। বরিশাল লঞ্চঘটে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেল। সমগ্র এলাকা জুড়ে মানুষের কোলাহল। এই যেন রাতের বেলার শহর। ভ্রমণপিপাসু পঞ্চরত্ন আবার বাংলাদেশের মানচিত্র খুলে বসল। তারপর কল্পনার যাত্রা শুরু হলো ঢাকার উদ্দেশে।

লঞ্চের সাইরেন বেজে উঠল ভোঁ ভোঁ করে। ভোরবেলা মামা এসে দাঁড়ালেন লঞ্চের রেলিং এর ধারে। পরক্ষণেই পঞ্চরত্ন পাশে এসে দাঁড়াল। শুভ্র নির্মল সকালে বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্য দেখে তারা মোহিত হলো।

সারি সারি লঞ্চ, স্টিমার, নৌকার ভিড় ঠেলে লঞ্চটি তীরে এসে ভিড়ে চারশত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ঢাকা শহরের তীরে।

ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর এই তেরোটি জেলা নিয়ে ঢাকা বিভাগ।

ঢাকা শহরে মহসিন মামা পঞ্চরত্নকে নিয়ে আসলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের এক শিক্ষক বন্ধুর বাসায়। যিনি একেধারে একজন চিত্রশিল্পী ও শিল্প সংগঠক। মামার বন্ধুকে পঞ্চরত্ন নাম দিল শিল্পী মামা।

যেহেতু মহসিন মামা আবাসিক কর্মশালায় থাকবে সেহেতু পঞ্চরত্ন থাকবে শিল্পী মামার বাসায়।

পঞ্চরত্নকে শিল্পী মামা জানালেন, আজ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কিশোরগঞ্জ থেকে আসা একটি জারি দলের গান এবং নাচের পরিবেশনা রয়েছে। আমরা সেখানে যাব এবং জারি শিল্পীদের সাথে কথা বলে জারি গান ও নাচ সম্পর্কে জানব। এই কথা শুনে সমীর মহা উৎসাহে বলল এবার তাহলে স্বচক্ষে আমরা জারি গান ও নাচের পরিবেশনা দেখতে পাব।

পুরো সন্ধ্যাটা এক ভাললাগা অনুভূতি নিয়ে তারা জারি গান ও নাচের পরিবেশনা উপভোগ করল। কি বলিষ্ঠ পরিবেশনা ছিল দলের সব সদস্যের। অবশেষে এলো সে প্রতীক্ষিত ক্ষণ। জারি দলের প্রধানের সাথে শিল্পী মামা পঞ্চরত্নকে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি তাদেরকে জারি গান ও নাচ সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন।

জারিনাচ

বাংলাদশের লোকসংস্কৃতির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা রীতি হল জারি গান ও জারি নাচ। জারি শব্দের অর্থ বিলাপ বা ক্রন্দন। এই শব্দটির উৎপত্তি ফার্সি ভাষা থেকে। এটি একটি গীতি আখ্যানমূলক পরিবেশনা রীতি। ইসলাম ধর্মের ইতিহাসের কারবালা যুদ্ধের বীরত্ব ও বিয়োগাত্মক কাহিনি এই পরিবেশনা রীতির মুল উপজীব্য বিষয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে এই পরিবেশনা দেখা যায়। সাধারণত মহররম মাসে এটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। জারি গান নাচ সহযোগে পরিবেশিত হয়।

জারিগান কারবালার শোকাবহ ঘটনা কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাও জারিগানের বিষয় হিসেবে দেখা যায়। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে জারি গানের বিষয় বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে, মূলত মহররম ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছোটো আকারে গাওয়া হয় মর্সিয়া। জারি গান গাওয়া হয় বিস্তৃত সুরে। মহররম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মেলা, উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জারিগান ও জারিনাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে।

এটি একটি দলগত নৃত্য। শিল্পী সংখ্যা ৮-৯ জন বা তারও অধিক হতে পারে। জারিনাচ পরিবেশনার সময় মূলগায়েন সাদা রঙের পাঞ্জাবী, পাজামা এবং মাথায় লালসালুর পটকা বেঁধে রাখেন এবং দোহার বা খেলোয়াড়গণ সাদা রঙের ধুতি বা পাজামা ও স্যান্ডোগেঞ্জি পরিধান করেন।

কোমরে, বাম হাতের কব্জিতে, মাথায় লালসালুর পটকাবন্ধ, গলায় সবুজ স্কার্ফ, পায়ে ঘুঙ্গুর আর দুই হাতে সাদা, সবুজ বা লালরঙের রুমাল রাখেন। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নাচের তাল রাখার জন্য পায়ে ঘুঙ্গুর ও নাচের গতি পরিবর্তনের জন্য মূল গায়েন বাঁশি ব্যবহার করে থাকেন।

সাধারণত সমতল ভূমিতে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে জারিনাচ করে থাকে। একজন মূল গায়েন, একজন সহযোগী গায়েন ও একদল নৃত্যকার বা দোহার নাচ পরিবেশন করেন। মূল গায়েন ও সহযোগী গায়েন সাধারণত বৃত্তের বাইরে থাকেন, মাঝে মাঝে শুধুমাত্র মূল গায়েন বৃত্তের ভেতরে কেন্দ্রে অবস্থান করেন। মূলগায়েন মূলপালা শুরু করার আগে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে আহ্বানমূলক কথা বলেন। এরপরে শুরু হয় বন্দনাগীতি। বন্দনাগীতির ধুয়ো টেনে টেনে দোহার গোলাকার ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন। ধুয়ো বা ধুয়া হলো গানের যে পদ দোহারগণ বার বার গায় বা পুনরাবৃত্তি করেন। আর মূল গায়েন বন্দনাগীতির শেষে এসে সুর ঠিক রেখে উচ্চস্বরে বলে ওঠেন- 'বেশ করো ভাই'। এভাবে মূলপালা শুরু হয়।

যেভাবে আমরা জারি নাচ অনুশীলন করতে পারি

জারিনাচ অনুশীলনের জন্য যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন, সেগুলো হল- ভঙ্গি, পদভঙ্গি, হস্তভঙ্গি ও মুখভঙ্গি

ভঙ্গি

শিল্পীগণের ভঙ্গি হয় বলিষ্ঠ।

পদভঙ্গিঃ

এই পরিবেশেনা সময় মূল লক্ষ্য থাকে পদবিন্যাসের মাধ্যমে গানের তালে তালে চক্রাকার আকৃতি মেনে চলা। তবে তাদের মূল পদভঙ্গি হল- পদচলনের গতিবিধি সবসময় ডান দিকে হবে। এবার সকলে বৃত্তের ভেতর মুখ করে দাঁড়াব। এরপর ১, ২, ৩, ৪ সমান ছন্দে ডান দিকে যাব। ১ এ ডান পা, ২ এ বাম পা, ৩ এ ডান পা, ৪ এ বাম পা ব্যবহার করে চক্রের পথে চলব। ডান পা একবার বৃত্তের ভেতরে ,আরেকবার বৃত্তের বাইরে রাখব। আর বাম পা জায়গা পরিবর্তনের সাথে সাথে বৃত্তের পথ মেনে চলব অর্থাৎ বাম পায়ের ওপর থাকবে বৃত্তের দিক নির্দেশনার ভার।

ছন্দ	পদচলন
১	ডান
২	বাম
৩	ডান
৪	বাম

হস্তভঙ্গি

হস্তভঙ্গি করার জন্য লাল বা সাদা অথবা সবুজ রঙের রুমাল দুইহাতে বেঁধে নিয়ে দুইহাত ডান পায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একবার ভেতরে আরেকবার বাইরে ছুঁড়ে দেয়। দ্রুত লয়ের সময় হাতে তালিও দেয়া যেতে পারে।

মুখভঙ্গি

বর্ণনাত্মক এই পরিবেশনারীতিতে একটি অন্তর্নিহিত ভাব রয়েছে। মুখভঙ্গি অনুশীলন করে, সেই ভাব প্রকাশ করা যায় খুব সহজেই। সেই পরিবেশনা সবচেয়ে প্রাঞ্জল হয়, যে পরিবেশনায় গানের কথার ভাব মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে দর্শকের কাছে প্রকাশ পায় এবং দর্শকের মনেও একই অনুভূতির সঞ্চার করে। মুখভঙ্গি হিসেবে বীর রস ও করুণ রস দেখা যায়।

দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের অসংখ্য না বলা কথা প্রকাশ পায় চোখের দৃষ্টিতে। অর্থাৎ মানুষের মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম প্রধান প্রকাশমাধ্যম- দৃষ্টিভঙ্গি। বীর ও শোকের ভাব প্রকাশ করার জন্য এবার আমরা দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করব।

জারি দলের প্রধানের সাথে আলোচনার সময় দলের অন্যান্য সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে পঞ্চরত্নকে জারিনাচের বিভিন্ন ভঙ্গির সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। জারি দলের সকল সদস্যকে কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা জানিয়ে পঞ্চরত্ন বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে এল। রাতে বাসায় ফিরে পঞ্চরত্ন আর শিল্পী মামার অনেক আলোচনা হলো আজকের জারি দলের পরিবেশনা নিয়ে।

কথার ফাঁকে শিল্পী মামা বললেন কাল তোমাদের নিয়ে যাব পুরান ঢাকায়। সেখানে তোমরা বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় শিল্পধারার সাথে পরিচিত হতে পারবে। সেটি হলো আমাদের দেশের রিকশা পেইন্টিং। এই যেন এক চলমান শিল্পের জগৎ। পঞ্চরত্ন জিজ্ঞেস করল আমরা কি সেখানে রিকশা আর্টের শিল্পীদের সাথে কথা বলতে পারব? তাদের ছবি আঁকার করণকৌশল সম্পর্কে জানতে পারব? পঞ্চরত্নের প্রশ্ন শুনে শিল্পী মামা হেসে উত্তর দিলেন অবশ্যই পারবে। ঐ এলাকার প্রায় সব শিল্পীর সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। তারা অবশ্যই তোমাদের জানার বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

পরের দিন তারা তিনটি রঙিন রিকশায় চড়ে এল পুরান ঢাকার বকসিবাজার এলাকায়। এই এলাকায় রিকশা আর্টের কয়েকজন শিল্পী বসবাস করেন। সেখানে তারা একজন শিল্পীর বাসায় গেলেন। বাসার ভেতরের ছোট একটি রুমে শিল্পী বসে ছবি আঁকছিলেন। তারা যেতেই শিল্পী আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। শিল্পীর সাথে পঞ্চরত্ন পরিচিত হয়ে শুরু করল দীর্ঘ আলাপ। পঞ্চরত্নের প্রশ্ন অনুসারে শিল্পী একে একে বলে চললেন রিকশা আর্টের ইতিহাস ছবি আঁকার করণকৌশলহ সবকিছু। তিনি বললেন আমরা হলাম রিকশা আর্টের দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী।

রিকশা পেইন্টিং

এই দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বসবাস করেছে শিল্পের সাথে। যাদের হাত দিয়ে রচিত হয়েছে এই দেশের হাজার বছরের লোকশিল্পের। তাদের ছিল না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বংশ পরম্পরায় এই সব স্থানীয় লোক শিল্পীরা রচনা করেছেন এই ইতিহাস। যা আজ আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির মূল শিকড়। তেমনি এক দল স্বশিক্ষিত শিল্পীর হাত দিয়ে পঞ্চাশের দশকে রচিত হয়েছে এই দেশের রিকশা পেইন্টিং এর ইতিহাস। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এই তিন চাকার যানবাহনকে নিজেদের শৈল্পিক চিন্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত রাঙিয়ে যাচ্ছেন এই সব শিল্পী। এই যেন হাজার বছরের লোকশিল্পের এক নতুন সূচনা।

একটি রিকশায় অনেকগুলো অংশ থাকে যার প্রত্যেকটি অংশ তৈরির জন্য আলাদা আলাদা কারিগর রয়েছে। তার মধ্যে রিকশা পেইন্টারও রয়েছে। এই সব শিল্পী মূলত রিকশার পেছনের পাতলা টিনের শিটের ওপর ছবি আঁকেন। সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তন হয়েছে রিকশা পেইন্টিং এর ছবির বিষয়বস্তুতে।

প্রথম দিকে রিকশা পেইন্টিং এর বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য ছিল নায়ক, নায়িকার ছবি। এরপরে প্রাধান্য পায় রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে আঁকা কাল্পনিক শহরের ছবি। এক সময়ে রিকশা পেইন্টিং এ মানুষ আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় শিল্পীরা মানুষের পরিবর্তে বিভিন্ন পশুপাখি আঁকা শুরু করেন। যেমন—বাঘ বসে সেলাই করছে সেলাই মেশিনে। শিয়াল করছে রাস্তার ট্রাফিক কন্ট্রোল। খরগোশ ছানা চলেছে স্কুলে পিঠে ব্যাগ নিয়ে ইত্যাদি কাল্পনিক বিষয় উঠে আসে রিকশা শিল্পীদের ছবিতে।

তাছাড়া—বোরাক, দুলদুল, আরব্য রজনীর রাজপ্রাসাদ, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ও দৈত্য, তাজমহল, লন্ডন ব্রীজ, আইফেল টাওয়ারসহ দেশ বিদেশের কাল্পনিক ছবি এই সময় রিকশা পেন্টিং এ স্থান পায়।

স্বাধীনতার পরে রিকশা পেইন্টিং এ উঠে আসে স্মৃতিসৌধ, সংসদ ভবন, শহিদ মিনারসহ মুক্তিযুদ্ধের নানা দৃশ্য। বর্তমান সময়ে যমুনা সেতু, পদ্মা সেতু, ব্যস্ত শহরের দৃশ্য যেখানে ফ্লাইওভার রাস্তা ও বিমানবন্দর একসাথে আঁকা আছে, মৎস্য কন্যা, নদী আর গ্রাম ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। এছাড়া শিল্পীরা রিকশা অলংকরণের জন্য বিভিন্ন ফুল, লতা, পাতা, ময়ূর, হাঁস ইত্যাদি ছবি আঁকেন। এভাবে সময়ের পরিবর্তনের এক অঙ্কিত দলিল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের এই রিকশা আর্ট।

স্মৃতিসৌধ

শহিদ মিনার

রিকশা আর্টের শিল্পীরা রিকশার হুডের পেছনের অংশ এবং পেছনের চাকার উপরের গোল অংশসহ বিভিন্ন স্থানে অলংকরণের জন্য আল্লাহু, মা, ধন্যবাদসহ বিভিন্ন ধরনের লিখা ব্যবহার করেন যা তাদের নান্দনিক

মুক্তিযুদ্ধের ছবি

ফুল, লতা, পাতা

ক্যালিগ্রাফির প্রকাশ।

দেশের এক একটি রিকশা যেন এক একজন শিল্পীর হাতে আঁকা চলমান শিল্পকর্ম। দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে আমাদের দেশের রিকশা পেইন্টিং। যা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির

জন্য সম্মানের বিষয়। বাংলাদেশের রিকশা আর্টে দু'ধরনের অঙ্গসজ্জা দেখা যায়। প্রথমটা হচ্ছে রিকশা অ্যাপ্লিক আর্ট, দ্বিতীয়টা হলো রিকশা পেইন্টিং।

রিকশা পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে শিল্পীরা পাতলা টিন ব্যবহার করেন। শিল্পীরা প্রথমে টিনের পাতলাশিটের উপর সাদা এনামেল রঙের প্রলেপ দিয়ে নেন। রং শুকানোর পর তার উপর পেনসিল দিয়ে বিষয়বস্তুটি হালকাভাবে এঁকে নেন। তারপর বিষয়বস্তুতে রঙের প্রলেপ দেওয়া শুরু করেন। রিকশা পেইন্টিং এর জন্য শিল্পীরা এনামেল রং ব্যবহার করেন। উজ্জ্বল নীল, গোলাপি, সবুজ, বাদামি, হলুদ প্রভৃতি রঙের ব্যবহার করেন শিল্পীরা। যেহেতু এনামেল রং শুকানোর সাথে সাথে আঠালো হয়ে উঠে, তাই শিল্পীরা দ্রুত ছবির বিষয়বস্তুতে রঙের প্রলেপ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করেন। ছবি আঁকার সময় রঙের ঘনত্ব বেড়ে গেলে তাতে তারপিন তেল মিশিয়ে পাতলা করে নেন শিল্পীরা। রিকশা পেইন্টিং এর জন্য শিল্পীরা কাঠবিড়ালীর লোম দিয়ে তৈরি (squirrel hair brush) তুলিসহ বিভিন্ন রকমের তুলি বাজার থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন।

বিষয়বস্তুটিতে রং দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হলে তাতে কালো অথবা গাঢ় রং দিয়ে সূক্ষ্ম রেখা ব্যবহার করেন। এর পর বিষয়বস্তুতে সাদা অথবা হালকা রং দিয়ে সুক্ষ রেখার সাহায্যে আলোর ব্যবহারকে তুলে ধরেন। গতিশীল রেখার এই ব্যবহারই হলো রিকশা পেইন্টিং এর মূল বৈশিষ্ট্য। এরপর শিল্পীরা স্বাক্ষর দিয়ে তাদের শিল্পকর্ম সম্পন্ন করেন।

এই শিল্পটাকে আরো জনপ্রিয় করার জন্য বর্তমানে গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক সামগ্রীকে রিকশা পেইন্টিং দিয়ে অলংকৃত করা হচ্ছে। এই শিল্প আমাদের নিজস্ব তাই একে প্রচার আর প্রসারের মধ্য দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ যে দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি যত বেশি সম্মৃদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত।

শিল্পী মামা বলেন রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি আয়ত্তে আনার জন্য তোমরা কিছু অনুশীলন করতে পার।

এই পাঠে যেভাবে আমরা রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি অনুশীলন করব

শিল্পী মামা বলেন দীর্ঘ দিনের চর্চার ফলে রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি আয়ত্তে আসে। এর রঙের ব্যবহারও ভিন্ন। ফলে

- প্রাথমিকভাবে বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে রিকশা পেইন্টিং এর ফুল, লতা পাতা ইত্যাদি পোস্টার রং অথবা সহজলভ্য যেকোন রং দিয়ে অনুশীলন করতে পার। তাতে করে রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি আয়ত্তের কাজ শুরু হবে।
- বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে রিকশা পেইন্টিং এর ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন করতে পার।
- বইয়ে দেওয়া ছবি দেখে রিকশা পেইন্টিং এর আদলে স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনারসহ মুক্তিযুদ্ধের নানা দৃশ্য অনুশীলন করতে পার।
- অঙ্কনশৈলি আয়ত্তে এসে গেলে পরবর্তীকালে তোমরা এনামেল রং ব্যবহার করেও ছবি আঁকতে পার।

রিকশা পেইন্টিং সম্পর্কে জানতে জানতে সকলের খিদে পেয়ে গেছে। আগুন শিল্পী মামার দিকে করুণ চোখে

তাকিয়ে বলল, মামা বিরিয়ানি খাব। মামা হেসে বললেন, চল তোমাদের ঢাকার বিখ্যাত কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়াব। খুশিতে সকলের চোখ চকচক করে উঠল। পুরান ঢাকার একটি রেস্তোরাঁতে ঢুকে কাচ্চি বিরিয়ানি খেতে খেতে মামা জানালেন, ঢাকার মোগলাই খাবারের কথা। বিভিন্ন ধরনের কাবাব, বিরিয়ানি, বোরহানি, লাচ্ছি আরও কত রকমের খাবার! তবে বিশেষ একধরনের খাবার আছে যার নাম বাকরখানি—ময়দা দিয়ে এক ধরনের ভাজা রুটি।

খাবারের পালা শেষ, এবার তাদের ঢাকার ঐতিহাসিক জায়গা সমূহ ভ্রমনের পালা। তালিকার প্রথমেই আছে পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল।

আহসান মঞ্জিল

এটি ছিল মূলত ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। ১৮৭২ সালে নবাব আব্দুল গনি তাঁর পুত্র আহসানউল্লাহ এর নামে নামকরণ করেন। পুরান ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। এটি ঢাকার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। সুরম্য এই ভবনের ছাদে রয়েছে একটি বড় গম্বুজ। প্রবেশ মুখে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত যা প্রাসাদের আকর্ষণকে বহুগুন বৃদ্ধি করেছে। বারান্দা ও কক্ষগুলোর

মেঝেতে মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাসাদের বাইরের দেয়ালের গায়ের নকশাগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রাসাদটি বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এরপর লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, আর্মেনিটোলার আর্মেনিয়ান চার্চ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারা মসজিদ দেখে পঞ্চরত্ন আসল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

এখানে এসে যে স্থাপনাটি প্রথমে তাদের মন-প্রাণকে আলোড়িত করেছে তাহলো শহিদ মিনার। তারা পায়ের জুতা খুলে শহিদ মিনারের বেদিতে উঠল। চোখ বুজে পঞ্চরত্ন অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সে দিনটির কথা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় কি নির্ভয়ে সেদিন ঘাতকের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা। এরপর শিল্পী মামা তাদের শহিদ মিনার সম্পর্কে বলতে লাগলেন।

শহিদ মিনার

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে নির্মাণ করা হয়েছিল শহিদ মিনার। শিল্পী হামিদুর রহমানের রূপকল্পনায় হলো মধ্যস্থলের সুউচ্চ কাঠামোটি আনত মস্তকে স্নেহময়ী মাতার প্রতীক। দুই পাশে তুলনামূলক ছোট দুটি করে কাঠামো হলো সন্তানের প্রতীক স্বরূপ।

মূল পরিকল্পনায় আরও ছিল সামনে বাঁধানো চত্বর। পেছনে থাকবে দেয়ালচিত্র। ভাস্কর নভেরা আহমেদের দুটি ম্যুরাল থাকবে সম্মুখ চত্বরে।

উক্ত পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। এই সময় শিল্পী হামিদুর রহমানের সহকর্মী হিসেবে ভাস্কর নভেরা আহমদ এই কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিছুদূর কাজ এগুনোর পর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হওয়ায় শহিদ মিনার তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালে শহিদ মিনারের মূল নকশা বহুলাংশে পরিবর্তন করে একটি নকশা দাঁড় করানো হয়। এ নকশা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার উদ্বোধন করা হয়। এই শহিদ মিনারই একুশের চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবীর মানুষের মনে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দিলে শহিদ মিনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রতীক হয়ে ওঠে বিশ্ববাসীর কাছে।

এ সময়ে হঠাৎ করেই সমীরের মায়ের কাছে শেখা একটি ভাষার গানের চরণ মনে আসে। গানটির রচয়িতা হলেন চারণকবি শামসুদ্দিন আহমেদ তেলি। শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে সমীর গানটি গাইতে লাগল।

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙালি
তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি।
তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি
ও বাঙালি ও ও ও
তোতা পাখি পড়তে আইসা খোয়াইলি পরাণ

মায় সে জানে পুতের বেদন যার কলিজার যান রে বাঙালি ।

ও বাঙালি ও ও ও

ইংরাজ যুগে হাটুর নিচে চালাইতো গুলি

স্বাধীন দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে উড়ায় মাথার খুলি রে বাঙালি ।

ও বাঙালি ও ও ও

গুলি খাওয়া ছাত্রের রুহু কেন্দে কেন্দে কয়

তোমরা বাঙালি মা ডাকিও আমার অভাগিনী মায় রে বাঙালি ।

ও বাঙালি ও ও ও

বাপ কান্দে মায় কান্দে কান্দে জোড়ের ভাই

পাড়া পড়শি কেন্দে বলে আমার খেলার সাথী নাই রে বাঙালি ।

গানটি গাওয়া শেষ হলে পঞ্চরত্নের বাকি বন্ধুরা আবেগাপ্লুত হয়ে সমীরকে জড়িয়ে ধরল। অবনী বলল, ফিরে

গিয়ে স্কুলে আমরা এই গানটির জারিনাচের ভঙ্গির সাথে মিলিয়ে অনুশীলন করব। যাতে আমরা স্কুলের অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করতে পারি।

শহিদ মিনার থেকে পঞ্চরত্ন পায়ে হেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদ চত্বরে পৌঁছুল। এখানে রয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ। সে চত্বরে আরও শায়িত আছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান ও শিল্পগুরু শফিউদ্দীন আহমদ। সবার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে তাদের কানে মসজিদের মিনার থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। তার সাথে সাথে আকাশ সবাইকে মনে করিয়ে দিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত সেই বিখ্যাত গজল-

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই

যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ থেকে বাইরে বের হয়ে পঞ্চরত্ন খেয়াল করল অনেক তরুণ ছেলে মেয়ে ছবি আঁকার বোর্ড, ক্যানভাসসহ ছবি আকার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে একটা মনোরম স্থাপনার দিকে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে পঞ্চরত্নের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। শিল্পী মামা বিষয়টা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন এইসব তরুণ শিল্পী কোথায় যাচ্ছে সেটাইতো জানতে চাও, কি ঠিক না? সবাই সমস্বরে বলল ঠিক।

শিল্পী মামা বললেন সামনেই রয়েছে আমার প্রাণের জায়গা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। তারা সেখানে প্রবেশ করে দেখতে পেল বিভিন্ন স্থানে বসে শিক্ষার্থীরা পেনসিল স্কেচ, জলরং, প্রভৃতির মাধ্যমে ছবি আঁকছে। ছবি আঁকার এই মাধ্যমগুলো তারা চিনতে পেরেছে তবে অনেক মাধ্যম তারা ঠিক চিনতে পারছে না। শিল্পী মামা তাদেরকে মাধ্যমগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সাথে করে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ছাপচিত্রসহ সকল বিভাগে নিয়ে গেলেন। সেখানে তারা শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে মাধ্যমগুলো সম্পর্কে জানল। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। যে পৃথিবীতে শিল্পীরা মানুষের জন্য স্বপ্ন বুনে।

সেখান থেকে তারা গেল জাতীয় জাদুঘরে। এ যেন সমগ্র দেশটায় একটা ছাদের নীচে। জাদুঘরের প্রতিটি শিল্প সামগ্রীতে তারা নিজের দেশের সংস্কৃতিটাকে আবার খুঁজে বের করার চেষ্টা করল। যেমন করে তারা খুঁজে চলছে কল্পনার এই ভ্রমণের ভেতর দিয়ে।

এরপর মামা তাদের নিয়ে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের অনিন্দ্য সুন্দর 'অপরাজেয় বাংলা' দেখাতে। অপরাজেয় বাংলার সামনে এসে মামা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ভাস্কর্যটির দিকে।

অপরাজেয় বাংলা

ইরা মামাকে বলে উঠল, কি ভাবছ মামা? মামা বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর অপরাজেয় বাংলা এই দুটি যেন সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাম। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি। তিনজন দণ্ডায়মান মুক্তিযোদ্ধা যেন সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং এর নামকরণ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী। ভাস্কর্যটির দণ্ডায়মান তিনজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে দুজন পুরুষ ও একজন নারী।

দণ্ডায়মান তিনজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে একজন ডান হাতে দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে রাইফেলের বেল্ট ধরে আছেন। যিনি এই ভাস্কর্যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁর চোখমুখ স্বাধীনতার দৃঢ় চেতনায় উদ্দীপ্ত। এর মডেল ছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম বেনু। থ্রি নট থ্রি রাইফেল হাতে সাবলীল ভঙ্গিতে দাঁড়ানো অপর মডেল ছিলেন সৈয়দ হামিদ মকসুদ ফজল। আর নারী মুক্তিযোদ্ধার মডেল ছিলেন হাসিনা আহমেদ। ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় এ ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করা হয়। সেসময় থেকে এই অপরাজেয় বাংলা এই দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আকাশ শিল্পী মামাকে বলল, যে শিল্পী এই কালজয়ী ভাস্কর্যটি সৃষ্টি করেছেন আমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে চাই। শিল্পী মামা বললেন তাহলে শোন-

বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) থেকে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরে তিনি ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

জারুল, সোনালু আর কৃষ্ণচূড়ার রঙে রাঙ্গানো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামল প্রকৃতি তাঁকে নিবিড় মমতায় জড়িয়ে রেখেছিল সবসময়। ফলে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে। তিনি ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালে 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি তৈরির দায়িত্ব পান। সেসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুর উদ্যোগে কলাভবনের সামনে এই অমর ভাস্কর্যটির নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে তিনি ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং ১৯৭৯ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সেসময় থেকে এই অপরাজেয় বাংলা এই দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের অমর সৃষ্টিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রের সামনের দেয়ালে করা ম্যুরাল 'আবহমান বাংলা', বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনের টেরাকোটার শিল্পকর্ম, চাঁদপুর জেলার 'অঙ্গীকার স্মৃতিসৌধ', মা ও শিশু, অঙ্কুর, ডলফিন ইত্যাদি।

শিল্পকলা ও ভাস্কর্যে গৌরবজনক অবদানের জন্য তিনি ২০১৪ সালে 'শিল্পকলা পদক' এবং ২০১৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। ২০১৭ সালে এই শিল্পী মৃত্যুবরন করেন।

ধীরে ধীরে কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কারো সেদিকে খেয়াল নেই। শিল্পী মামা বললেন ঢাকার সবকিছু দেখতে হলে আরও অনেক সময়ের প্রয়োজন। চল আমরা এবার বাড়ি ফিরে যাই। এই বলে, তারা শিল্পী মামার বাড়ির উদ্দেশ রওনা হলো। এরপর তাদের ভ্রমণের গন্তব্য হলো ব্রহ্মপুত্র বিধৌত অঞ্চল ময়মনসিংহ বিভাগ।

এই অধ্যায়ে আমরা যা করব –

- রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য পোস্টার রং অথবা যেকোনো সহজলভ্য মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন করব।
- রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলি অনুসরণ করে পোস্টার রং অথবা যেকোনো সহজলভ্য মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ছবি আঁকব।
- আমরা জারিনাচের ভঙ্গিগুলো অনুশীলন করব। ভাষা আন্দোলনের গান 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' এর সাথে জারিনাচের ভঙ্গিগুলো মিলিয়ে সহজ সরল একটি পরিবেশনা তৈরি করব।
- নিজেদের আশেপাশে কোনো রিকশা পেইন্টার আছে কিনা অনুসন্ধান করব। যদি থাকে তবে তাঁর কাছে রিকশা পেইন্টিং এর অঙ্কনশৈলী এবং মাধ্যমের ব্যবহার শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব।
- নিজেদের এলাকায় শহিদ মিনার অথবা মুক্তিযুদ্ধের কোন ভাস্কর্য/ স্থাপনা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করব। যদি থাকে তা ভালভাবে দেখব এবং বন্ধুখাতায় তার বর্ণনা লিখব।
- ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।